তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে ঈশতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

(Theological Summary of the Image of God)

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধীয় মতবাদের অর্থ ও তাৎপর্যের ঈশতাত্ত্বিক বর্ণনার সংক্ষিপ্তসারের উপস্থাপন। এর আগে আমরা দেখেছি, একমাত্র মানুষের বিষয়ই এমন কথা বলা হয়েছে — অন্য কোনও সৃষ্টির বিষয় এমন কথা বলা হয়নি— যে তাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে থাকার অর্থ, অবশ্যই এমন বিষয়কে নির্দেশ করা, যা কেবল মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। তাই, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির ধারণা খ্রীস্টীয় মনুষ্যতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়।

বাইবেল যখন বলে যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে নির্মাণ করেছিলেন, তখন অবশ্যই যে কথা বলে, তা হল, সৃষ্টির সময় মানুষ ঈশ্বরের বাধ্য ছিল এবং সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসত (উদাহরণস্বরূপ আদি. ১:৩১ পদ দেখুন, যেখানে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকে 'উত্তম" বলা হয়েছে)। কিন্তু আদি. ১:২৭ পদে মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ***"ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ নির্মাণ করলেন,"*** তার দ্বারা নিশ্চয়ই মানুষের আত্মিক ও নৈতিক শুদ্ধতার থেকেও বেশি কিছু বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে। তার সৃষ্টির এই অদ্বিতীয় দিকেকে বর্ণনা করার দ্বারা মানুষকে সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই বিবৃতির দ্বারা কেবল এই কথা বলা হয়নি যে, শুরুতে মানুষ তার জীবন কোন্ দিক লক্ষ্য করে যাপন করছিল (অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা), কিন্তু এর দ্বারা তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে নেদারল্যান্ডের ঈশাতাত্ত্বিক হারমান বাভিঙ্করে মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, যিনি এমন কথা বলেছেন, বাইবেলের শিক্ষানুসারে মানুষ কেবল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অধিকারী নয়, কিন্তু মানুষ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি;এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তার সর্বত্র বিস্তারিত (Herman Bavink, *Dogmatiek, 2:595-96)*। এ কথার অর্থ কোনও দূর্ঘটনার ফলস্বরূপ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়নি, যা সে মানুষ হিসাবে তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেও হারাতে পারে, কিন্তু তা হল তার অস্তিত্বে অত্যাবশ্যক, এমন একটি বিষয়।

'প্রতিমূর্তি' (En. *image,* Hb. *tselem* and *demuth)* শব্দের মধ্যে যে প্রাথমিক অর্থ লুকিয়ে আছে, তা হল, সাদৃশ্য: যা আমাদের বলে যে, মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন সে ঈশ্বরের সদৃশ ছিল। আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্গত, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এ বিষয়ে পরে অলোচনা করা হবে। কিন্তু শুরুতে যে বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, তা হল, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা সাদৃশ্য হিসাবে মানুষের ধারণা আমাদের বলে যে, **ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করতে** এবং **ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে** মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

প্রথমত, ঈশ্বরকে প্রতিফিলিত করতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আয়না বা দর্পন যেমন প্রতিফলিত করে, ঠিক তেমনই মানুষের উচিৎ ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করা। যখন কেউ কোনও মানুষের দিকে তাকায়, তখন তার মধ্যে ঈশ্বরের এক প্রকার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া উচিৎ। একে অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে ঈশ্বর দৃশ্যগ্রাহ্য হন। অবশ্যই, অন্যান্য সৃষ্টজীব, এমনকী আকাশমণ্ডলও ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, কিন্তু কেবল মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দৃশ্যগ্রাহ্য হয়ে থাকেন। সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিকরা ঈশ্বরের সাধারণ প্রকাশের কথা বলে থাকেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর উপস্থিতি, ক্ষমতা, এবং ঈশ্বর-প্রকৃতি তাঁর হাতের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু মানুষের সৃষ্টিতে ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় পদ্ধতিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সে তাঁর এক প্রকার দর্পনের প্রতিমূর্তি। তার সৃষ্টিকর্তা, তথা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়ার যে বিশেষ অধিকার মানুষকে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে বড় কোনও সম্মান মানুষকে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

এই সত্যকে দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় আজ্ঞায় প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) নির্মাণ করতে নিষেধ করার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে: ***"তুমি নিজের জন্য খোদিত প্রতিমা*** (En. *image)* ***নির্মাণ কোরো না"*** (যাত্রা ২০:৪)। তাঁর সৃষ্টজীব তাঁর প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) নির্মাণ করে, তা ঈশ্বর চান না; যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে তাঁর নিজের একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছেন: একটি জীবন্ত, গতিশীল, বাক্‌শক্তির

সঙ্কীর্ণ অর্থে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হয়েছে; কিন্তু বিস্তৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি লুপ্ত হয়নি, কিন্তু তা দূষিত ও কলুষিত হয়েছে।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির এই দুটি দিক মানুষের গঠনগত দিক এবং ব্যবহারিক দিকের সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। সমস্যা হল, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে আমরা এর মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করব? (১) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে আমরা কি কেবল **মানুষ কী**, তাকে অন্তর্ভুক্ত করব; সে কী করে, তাকে অন্তর্ভুক্ত করব না? (২) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে আমরা কি কেবল **মানুষ কী করে**, তাকে অন্তর্ভুক্ত করব; সে কী, তাকে অন্তর্ভুক্ত করব না? (৩) না-কি, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে, **মানুষ কী**, এবং **সে কী করে**, উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করব? অন্য ভাবে বলা যায়, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে **মানুষ কীভাবে কাজ করে**, তার বর্ণনা; না-কি, তা **মানুষ কী ধরণের অস্তিত্ব**, তারও বর্ণনা? কিছু কিছু ঈশতাত্ত্বিক এখানে কেবল মানুষের গঠনগত দিকের (মানুষ কী ধরণের অস্তিত্ব) উপর জোর দিয়ে থাকেন; কিন্তু অন্য ঈশতাত্ত্বিকরা কেবল তার ব্যবহারিক দিকের (মানুষ কী করে) উপর জোর দিয়ে থাকেন।

আমাদের উচিৎ এই দুই দিককেই স্বীকার করা। যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেইহেতু, এর মধ্যে গঠনগত ও ব্যবহারিক, উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি বিশেষ গঠন না থাকলে কেউ কখনও সেই সমস্ত কাজ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাখি তার পাখা নাড়িয়ে বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যায়— এটি হল তার কাজ বা ব্যবহারের একটি দিক। কিন্তু পাখিটির যদি পাখা বা ডানা না থাকত, তাহলে কিন্তু সে উড়তে পারত না— তাই, পাখা বা ডানা হল তার গঠনের একটি দিক। একইভাবে, মানুষদের এমন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তারা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ বা ব্যবহার করতে পারত: যেমন ঈশ্বরের আরাধনা করা, প্রতিবেশিদের প্রেম করা, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করা, ইত্যাদি। কিন্তু তারা এই ভাবে কাজ বা ব্যবহার করতে পারে না, যদি না ঈশ্বর তাদের এই সমস্ত কাজ করার জন্য উপযুক্ত গঠনগত সক্ষমতা দেন। তাই, আমরা যখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কথা বলি, তখন তার মধ্যে গঠনগত ও ব্যবহারিক, উভয় দিককেই নির্দেশ করে থাকি।

এ বিষয়ে খ্রীস্টীয় ঈশতত্ত্বে একটি পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে। পূর্বকালের ঈশতাত্ত্বিকদের চিন্তানুসারে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রাথমিক ভাবে তার গঠনগত সক্ষমতার (যুক্তিক্ষমতা, নৈতিকতা, ইত্যাদি বিষয়ে তার অধিকার) মধ্যে দেখা হয়েছে (ইরেনিউয়াস বা থমাস অ্যাকুইনাসের চিন্তা); এবং তার কার্যগত বা ব্যবহারিক দিককে তার গঠনের সংযোজিত অংশ বা পরিশিষ্ট হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের ঈশতাত্ত্বিকরা এই সুনিশ্চিত ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের কাজ বা ব্যহারিক দিকই (তার আরাধনা, সেবা, প্রেম, কর্তৃত্ব, ইত্যাদি) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অত্যাবশ্যক উপাদান (কার্ল বার্থ বা বেরকুওয়ারের শিক্ষা)। এই দ্বিতীয় চিন্তার মধ্যে যে বিপদ লুকিয়ে আছে, তা হল, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে *কেবল* কাজ বা ব্যবহারের দিক থেকে চিন্তা করা— যা হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে কেবল গঠনগত দিকের মধ্যে দেখার ন্যায় একই ধরণের একপেশে *(one-seded)* ধারণা।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মধ্যে গঠনগত ও ব্যাহারিক, উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত। এই দুই দিককে নির্দেশ করতে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: বিস্তৃত ও সঙ্কীর্ণ প্রতিমূর্তি *[*H. Bavink, Louis Berkhof*: broader & narrower image]*, আনুষ্ঠানিক ও বস্তুগত প্রতিমূর্তি *[*Bruner: *formal & material image]*, সারবস্তু ও সম্পর্ক *[*Hendrikus Berkhof: *substance & relationships]*, বৃত্তিদান ও সৃজনশৃলতা *[*David Crains: *endowment & creativity]*। কিন্তু উভয়েই ঈশ্বরের প্রমিতমূর্তির অত্যাবশ্যক দিক। হারমান বাভিঙ্ক বিষয়টিকে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন:

> ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে বিস্তৃত এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে বিভক্তকরণের দ্বারা সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিকরা সবথেকে স্পষ্টভাবে সারবস্তু ও গুণমানের মধ্যে, প্রকৃতি ও অনুগ্রহের মধ্যে, সৃষ্টি ও মুক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। *[* Herman Bavink, *Dogmatiek, 2:590~94]*

ক। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির গঠনগত দিক *(Structural aspects of the Image of God)*

কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি: বিস্তৃত বা আনুষ্ঠানিক বা গঠনগত দিক থেকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্গত? খ্রীস্টীয় ঈশতত্ত্বের ইতিহাসের প্রথম যুগে মানুষের **বুদ্ধিমত্তা** ও **যুক্তিশক্তিকে** *(intellectual & rational power)* বিস্তৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে, এখানে প্রতিমূর্তির মধ্যে মানুষের **নৈতিক স্পর্শকাতরতা** *(moral sensitivity)* (যার অর্থ ঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা) এবং তার **বিবেক বা সৎসংবেদকে** *(conscience)* অন্তর্গত করা হয়েছে। **ধর্মীয় আরাধনা করার ক্ষমতাকে** এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একে জন্ ক্যালভিন্ "স্বর্গীয় বিষয়ে সচেতনতা" *(awareness of divinity)* বলেছেন।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির এই দুই দিককে (বিস্তৃত ও সঙ্কীর্ণ অর্থে, গঠনগত ও ব্যবহারিক দিক, অথবা আনুষ্ঠানিক ও বস্তুগত দিক) কখনও পৃথক করা সম্ভব নয়। আমরা যখনই কোনও মানুষকে দেখি, তখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির এই দুই দিককেই আমাদের চিন্তা করতে হবে। কিন্তু মানুষের পাপে পতন, তার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করার পদ্ধতিতে ক্ষতিসাধন করেছে। পাপে পতনের পূর্বে আমরা যখন সঠিক পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করতাম, কিন্তু পাপে পতিত হবার পর আমরা আর তা আমাদের নিজেদের শক্তিতে করতে সক্ষম নই, যেহেতু এখন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দশায় *[state of rebellion]* জীবন যাপন করছি।

এই কারণে আমরা এমন কথা চিন্তা করতে পারি যে, পাপে পতনের পর মানুষ আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক নয় (কিছু কিছু ঈশতাত্ত্বিক এমন শিক্ষাই দিয়েছেন)। কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, শাস্ত্রের বিভিন্ন সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে আমরা পরিষ্কার দেখেছি যে, আমাদের এমন কথা বলা উচিৎ নয়। বাইবেলের বিভিন্ন অংশের সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে, পাপে পতিত মানুষকে এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক বলা হয়েছে, যদিও অন্যান্য সাক্ষ্য এ কথাও বলে যে, সে এখন সঠিক ভাবে ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করতে পারে না;আর তাই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে। অতএব, এক অর্থে, পাপে পতিত মানুষ এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক, কিন্তু আরও এক অর্থে, তাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নবীকরণ করতে হবে। তাই, আমাদের এ কথা বলা কখনও উচিৎ নয় যে, পাপে পতিত হবার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হয়েছে;তার পরিবর্তে আমাদের এমন কথা বলা উচিৎ যে, পাপে পতনের ফলস্বরূপ সেই প্রতিমূর্তি দূষিত বা বিকৃত হয়েছে। তথাপি সেই প্রতিমূর্তি এখনও সেখানে বর্তমান। এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, পাপ কত গুরুতর বিষয়;কারণ পাপে পতনের ফলস্বরূপ, মানুষ এখন ঈশ্বর-দত্ত এবং ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা ও তালন্ত দিয়ে এমন সমস্ত বিষয় করছে, যেগুলি প্রকাশ্যে তার সৃষ্টিকর্তাকে অপমাণিত করে।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির এই দুই দিককে (গঠনগত ও ব্যবহারিক দিক) পৃথক করার দ্বারা মানুষের পাপে প্রাক-পতন ও উত্তর-পতন পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির গঠনগত দিকের অধিকারী ছিল, এবং একই সময়ে সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির ব্যবহারিক দিকেরও অধিকারী ছিল;যেহেতু সে তখন ঈশ্বরের প্রতি নিখুঁত বাধ্যতার জীবন যাপন করত। কিন্তু পাপে পতিত হবার পর, যদিও সে বিস্তৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির গঠনগত দিক অব্যাহত রেখেছে, কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ অর্থে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির ব্যবহারিক দিক হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ঈশ্বর তাদের যে সমস্ত ক্ষমতা ও তালন্ত দিয়েছিলেন, পাপে পতিত মানুষ এখনও তাদের অধিকারী, কিন্তু এখন সে সেই সমস্ত ক্ষমতা ও তালন্তকে পাপপূর্ণ পথে ও অবাধ্যতার পথে ব্যবহার করে চলেছে। তাঁর আত্মার দ্বারা ঈশ্বর যখন মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করেন, তখন তিনি সেই বিকৃত প্রতিমূর্তির নতুনীকরণ করেন— অর্থাৎ, ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা ও দান দিয়ে পুনরায় ঈশ্বরকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে তিনি তাদের সক্ষম করেন— অন্ততঃ নীতিগত অর্থে। দেহের পুনরুত্থানের পর, নতুন পৃথিবীতে, মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ আবার নিখুঁত ভাবে ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হবে।

এই কারণে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের তার গঠনগত দিক (তার উপহার-দান, ক্ষমতা, এবং প্রতিভা) এবং ব্যবহারিক দিক (তার কাজ বা ব্যবহার, ঈশ্বর ও অন্যদের প্রতি তার সম্পর্ক, বিভিন্ন দান ব্যবহারের পদ্ধতি)— উভয় দিককেই নির্দেশ করতে হবে। কোনও একটি দিককে জোর দেবার জন্য আমরা যদি এর অন্য দিককে অবহেলা করি, তাহলে তা একপেশে আচরণ হবে। আমাদেরকে এর উভয় দিককেই দেখতে হবে ও জোর দিতে হবে, যদিও মানুষের গঠনগত দিককে আমরা গৌণ এবং ব্যবহারিক দিককে মূখ্য বিষয় হিসাবে ধরতে পারি। ঈশ্বর আমদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা একটি কর্মভার সম্পন্ন করি, একটি বিশেষ দায়িত্ব পূর্ণ করি, একটি আহ্বানের উদ্দেশে দৌড়াই। সেই কাজ বা ব্যবহার করার জন্য আমাদের সক্ষম করতে ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন উপহার-দানে ভূষিত করেছেন— সেই সমস্ত উপহার-দান, যেগুলি তাঁর মহত্ব ও গৌরবের কিছু বিষয় প্রতিফলিত করে। তাই, মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে দেখার অর্থ তার কাজ ও উপহার-দান, উভয়কেই দেখা। কিন্তু তার কাজ বা ব্যবহারই হল প্রাথমিক বিষয়, উপহার-দান হল গৌণ বিষয়। কারণ সেই কাজ বা ব্যবহার পূর্ণ করতে উপহার-দান হল উপায় মাত্র।

২। *ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি হিসাবে খ্রীস্ট* *(Christ as the true Image of God)*

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে কী বোঝায়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এবার আমরা যীশু খ্রীস্টের প্রতি দৃষ্টি দেব। কারণ নতুন নিয়মে যীশু খ্রীস্টকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি চরম উৎকর্ষ *[par excellence]* বলা হয়েছে; কলসীয় ১:১৫ পদে তাঁকে ***"অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি"*** বলা হয়েছে। তাই, আমরা যদি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কীসের ন্যায়, তা দেখতে চাই, তাহলে আমাদের উচিৎ প্রথমে খ্রীস্টের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। এর অর্থ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কেন্দ্রীয় বিষয় যুক্তিশক্তি বা বুদ্ধিমত্তা নয়, কিন্তু প্রেম;যেহেতু খ্রীস্টের জীবনে অন্য সমস্ত বিষয় অপেক্ষা যে বিষয়টি সবথেকে বেশি প্রকাশিত, তা হল তাঁর

এখন, এই সমস্ত অলৌকিক কাজ তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতির পক্ষে সাক্ষ্য (চিহ্ন) ছিল, না কি, স্বর্গীয় পিতার উপর নির্ভর করে খ্রীস্ট তাঁর মানব-প্রকৃতিতে কী করতে পারেন, তার প্রকাশ ছিল? আমরা খ্রীস্টের ঈশ্বর-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতিকে পৃথক করতে পারি না;চ্যালসেডন সম্মেলনের ঘোষণাতে যেমন বলা হয়েছে— খ্রীস্টের মধ্যে এই দুই প্রকৃতি সর্বদা **অমিশ্রিত, অপরিবর্তিত, অবিভক্ত, অথবা অপৃথকীকৃত** হয়ে **একসঙ্গে বর্তমান**। তথাপি, বাইবেলের কিছু কিছু বিবৃতি থেকে মনে হয় যে, ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যীশু এই সমস্ত অলৌকিক কাজ তাঁর নিখুঁত মানব-প্রকৃতিতে সাধন করেছিলেন: ***"কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে"*** (মথি ১২:২৮); ***"হে ইজরায়েল এই সমস্ত কথা শোন। নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন সকল দ্বারা তোমাদের কাছে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রমাণিত মানুষ; তাঁরই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কাজ করেছেন, যেমন তোমরা নিজেই জানো"*** (প্রেরিত ২:২২, পিতরের পঞ্চাশত্তমীর প্রচার থেকে)।

অবশ্য, এ বিষয়ে আমরা কেউ গোঁড়ামি করতে পারি না। যীশু ছিলেন ঈশ্বর-মানব, আর তাই, তিনি যা করেছিলেন, তা তিনি এমন একজন হয়ে করেছিলেন, যিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ ছিলেন। নিশ্চিতভাবে, যীশু যেমন করেছিলেন, আমরা কেউই সেই ভাবে অলৌকিক কাজ সাধন করতে পারি না;আমরা ঝড়কে থামাতে কিংবা মৃতকে জীবন দিতে পারি না। কিন্তু আমরা খ্রীস্টের জীবন থেকে শিক্ষা করি যে, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বকরণ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির ব্যবহারের একটি অত্যাবশ্যক দিক— যা আমাদের বিভিন্ন পথে বাস্তবায়িত করা উচিৎ।

সংক্ষেপে, ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি, যীশু খ্রীস্টকে দেখে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হল, প্রতিমূর্তির সঠিক ব্যবহারের মধ্যে ঈশ্বর-অভিমুখী হওয়া, প্রতিবেশি-অভিমুখী হওয়া এবং প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বকরণ বর্তমান।

৩। *তিন ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষ (Man in his threefold relationship)*

ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি, যীশু খ্রীস্ট যেমন তিন-ধরণের সম্পর্কের মধ্যে কাজ বা ব্যবহার করেছেন, মানুষও তাঁর মতো এই তিন ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ। আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে, এমন কথা বলা হয়েছে,

> (২৬) পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎসদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। (২৭) পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়ে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। (২৮) পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎসগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।

ঈশ্বর মানুষকে তিন-ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ করেছেন: মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক। এখানে, প্রথমত, ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের সৃষ্টি, মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এবং মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশকে উদ্ধৃত করার মাধ্যমে, মানুষ যে প্রাথমিক সম্পর্কে আবদ্ধ, তাকে নির্দেশ করা হয়েছে: অর্থাৎ, ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককেও নির্দেশ করা হয়েছে, যেহেতু এমন কথা বলা হয়েছে "পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে সৃষ্টি করলেন।" তৃতীয়ত, প্রকৃতির উপর ঈশ্বর আমাদের কর্তৃত্ব দানের মাধ্যমে, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়েছে।

এই তিনটি সম্পর্কের বিষয় নিচে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করব— আমাদের প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী, আমরা কীভাবে জীবন-যাপন করব, সে বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী।

ক। মানুষ হওয়ার অর্থ ঈশ্বর-অভিমুখী হওয়া—

মানুষ হল এমন জীব, যে তার অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের কাছে ঋণী, যে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, এবং প্রাথমিক ভাবে ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্বশীল। এটি হল তার প্রথম ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। মানুষের অন্য সমস্ত সম্পর্ক এই সম্পর্কের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

তাই, প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে হলে, সবার উপরে আমাদের ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে, তাঁতে আস্থা রাখতে হবে ও তাঁর বাধ্য হতে হবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে ও তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের

আর আগামী জীবনে, আমরা যখন নিখুঁত মানব-প্রকৃতির অধিকারী হব, তখন আমরা কেউ বিয়ে করব না, বিবাহিতাও হব না (মথি ২২:৩০)।

অতএব, পুরুষ-স্ত্রী সম্পর্ক মানুষদের মধ্যে সহভাগিতার প্রয়োজনীয়তাকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু এই সম্পর্ক সম্বন্ধে আদিপুস্তক ১ ও ২ অধ্যায়ে যে কথা বলা হয়েছে, তা আমাদের সাধারণ সঙ্গী অন্য মানুষদের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। স্ত্রীলোক ব্যতীত পুরুষমানুষ কেবল অসম্পূর্ণ নয়, অথবা পুরুষমানুষ ব্যতীত স্ত্রীলোক কেবল অসম্পূর্ণ নয়, অন্য পুরুষমানুষ ব্যতীত একজন পুরুষও অসম্পূর্ণ, অন্য স্ত্রীলোক ব্যতীত একজন স্ত্রীলোকও অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ, একাকী পৃথকীকৃত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরুষমানুষ বা স্ত্রীলোক কখনও প্রকৃত মানব-প্রকৃতির অধিকারী হতে পারে না; তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন অন্যদের সহভাগিতা ও উদ্দীপনা। আমরা সামাজিক জীব। প্রতিবেশিকে নিজের মতো প্রেম করতে বলার দ্বারা মানুষের জীবনে প্রতিবেশির প্রয়োজনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অন্যদের বাদ দিয়ে মানুষ কখনও প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে না। এই কথা মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অর্থেও একইভাবে সত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ফ্রান্সের এভিরণ সহরতলী থেকে একটি বালক তার পিতামাতার দ্বারা একটি বনে পরিত্যক্ত হয়। অনেক বৎসর পর তাকে খুঁজে পাওযা যায়। কিন্তু তাকে মানুষের থেকে অনেক বেশি পশুর মতো দেখতে লাগে। সে বাদাম, ওক গাছের ফল, বন্য ফল খেত। সে ঘোঁতঘোঁত করার ন্যায় কথা বলত, সে কখনও সংলগ্ন ভাবে কথা বলতে শেখেনি *[*Haran Lane, *The Wild Boy of Aveyron, (Cambridge: Havard Univ. Press, 1976).]*। এর থেকে মনে হয়, অন্য মানুষদের সংস্পর্শ ও সহভাগিতা ব্যতীত কোনও মানুষ তার পুরুষ বা স্ত্রীসুলভ গুণাবলির অধিকারী হতে পারে না।

বিষয়টি অন্য দিক থেকে দেখলেও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। অন্যদের সংস্পর্শে এলেই কেবল আমরা নিজেদের প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে পারি, আমাদের সবলতা ও দুর্বলতার বিষয়গুলি কী কী, তা আমরা উপলব্ধি করি। অন্যদের সঙ্গে সহভাগিতাতেই কেবল আমরা বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা লাভ করি। আমাদের মধ্যে সম্ভাবনা সকল কেবল অন্যদের সহভাগিতায়ই পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। এ কথা আমাদের সমস্ত সম্পর্কের জন্য প্রযোজ্য: পরিবার, বিদ্যালয়, মণ্ডলী, কর্মক্ষেত্র, অবসর বিনোদনের স্থান, এবং এই প্রকার অন্যান্য বিষয়।

আমরা একে অন্যকে সমৃদ্ধ করে থাকি। দলগত অর্থে এ কথা প্রযোজ্য। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন শিক্ষা, বিভিন্ন আহ্বান, বা বিভিন্ন জীবিকার মানুষ আমাদের সমৃদ্ধ করে থাকে। তাই, কেবল 'নিজের ন্যায় মানুষদের' সঙ্গে সামাজিক সহভাগিতা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

অন্যদের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্কের অর্থ, প্রত্যেক মানুষের উচিৎ তার তালন্ত বা প্রতিভাকে যেন কেবল নিজের মর্যাদা বা ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে চিন্তা না করা। কিন্তু তাদেরকে যেন অন্যদের সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করে। এব অর্থ, আমরা যেন সর্বদা অন্যদের সাহায্য করতে, তাদের ক্ষমত আরোগ্য করতে, তাদের অভাব পূর্ণ করতে, তাদের ভার বহন করতে, তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে আগ্রহী হই। এর অর্থ আমরা যেন অন্যদের নিজের মতো প্রেম করি। এর অর্থ, অন্যের দ্বারা গৃহিত হবার, অন্যের অংশীদার হবার, অন্যের কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে আমরা প্রত্যেকে অধিকারী। অর্থাৎ, অন্যদের গ্রহণ করা ও অন্যদের ভালোবাসা হল মানব-প্রকৃতির একটি অত্যাবশ্যক দিক।

গ) মানুষ হওয়ার অর্থ প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করা—

আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদ প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বা কর্তৃত্বের কথাও বর্ণনা করে। পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত বিষয়ের উপর মানুষকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কর্তৃত্বের তাৎপর্য সম্বন্ধে আমরা ঈশতাত্ত্বিকদের মধ্যে চিন্তার পার্থক্য দেখতে পাই। কিছু কিছু ঈশতাত্ত্বিক এই কর্তৃত্বকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টির একটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসাবে চিন্তা করেছেন; সেই প্রতিমূর্তির একটি অত্যাবশ্যক দিক হিসাবে নয় *[* J. Skinner, *Critical & Exegetical Commentary on Genesis;* H. Gunkel, *Genesis;* Berkouwer, *Man]*। কিন্তু বেশিরভাগ ঈশতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর উপর মানুষের কর্তৃত্ব হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির একটি অত্যাবশ্যক দিক *[*Luther, *Lectures on genesis;* John Laidlaw, *The Bible Doctrine of Man;* Bavink, *Dogmatiek;* L. Vander Zanden, *De Mens als Beelds Gods;* L. Berkhof, *Systematic Theology;* H. Berkhof, *De Mens Onderweg;* L. Verduin, *Less than God]*। আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে যেমন ঈশ্বরকে সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বকারী হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে, মানুষকে এখানে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি *[vicegerent]*, তথা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বকারী ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর মানুষের কর্তৃত্ব

এই তিনটি সম্পর্ক কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত?

ঈশ্বরের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ যে সম্পর্ককে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা একে অন্যের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত? তারা কি একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ? এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক অন্য দুটি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মণ্ডলীর ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই তিনটি সম্পর্কের মধ্যে কেবল প্রথম সম্পর্ককে প্রকৃত অর্থে গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং অন্য দুটিকে কেবল প্রথম সম্পর্ককে পূর্ণ করতে প্রয়োজন বলা হয়েছে। আমরা প্রথম সম্পর্ককে উল্লম্ব সম্পর্ক *[vertical relationship]* বলতে পারি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে খ্রীস্টধর্মের অনুভূমিক সংস্করণ *[horizontalizing version of Christianity]* আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে দ্বিতীয় সম্পর্কটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এবং কেবল প্রতিবেশির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রকাশ পায়। এর সঙ্গে আরও এই কথা যোগ করা প্রয়োজন যে, আমাদের এই প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে আমাদের তৃতীয় সম্পর্কটি অন্য দুটি সম্পর্ক অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। অন্তত বিভিন্ন শিল্প-সমৃদ্ধ দেশে এই সম্পর্ক অন্য দুটি সম্পর্ককে গ্রাস করে চলেছে, যেখানে এই তৃতীয় সম্পর্কের জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করা হচ্ছে— প্রযুক্তির সংরক্ষণ ও বিকাশে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেকে এমন কথা পর্যন্ত বলে থাকেন যে, এই তৃতীয় সম্পর্ক আমাদের জীবনের উপর এতখানি আধিপত্য বিস্তার করেছে যে, আধুনিক যুগের মানুষ আমরা দ্রুত গতিতে মেশিনের ও কম্প্যুটারের দাসে রূপান্তরিত হয়ে চলেছি।

কিন্তু বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর আমাদেরকে এই তিনটি সম্পর্কে আবদ্ধ করেছেন। এদের প্রতিটি সম্পর্ক অন্য দুটি সম্পর্কের ন্যায় সম পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহায্য;আমরা তাদের কোনও একটিকে বাদ দিয়ে সঠিক ভাবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বা কাজ করতে পারি না। মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে এমন সম্পর্কে আবদ্ধ, যে সে কখনও এড়াতে পারে না;এটি সবথেকে প্রথম এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু অন্য দুটিকে বাদ দিয়ে এই সম্পর্ক অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, এবং অন্য দুটিকে বাদ দিয়ে এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রতিবেশিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হল এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ পায়; যেমন বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিবেশিকে ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম প্রকাস করে থাকি। যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে ভালোবাসে না আর সে বলে যে, সে ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে মিথ্যাবাদী (১যোহন ৪:২০)। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম এবং প্রতিবেশির প্রতি াামাদের প্রেম এক ধাপ এগিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টির উপর আমাদের কর্তৃত্ব ও তার যত্নের মাধমেও প্রকাশ পেতে বাধ্য। যখন আমরা আমাদের প্রতিবেশিদের ভালোবাসি এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি আমরা দায়িত্বশীল আচরণ করি, তখন আমরা একই সঙ্গে ঈশ্বরেরও সেবা করে থাকি (এ বিষয়ে আরও জানার জন্য *[Hendrikus Berkhof, De Mens Onderweg, pp. 41~44]* পাঠ করুন)।

এখানে আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, মানুষের ন্যায় এমন তিন-সম্পর্কে আবদ্ধ অন্য কোনও সৃষ্ট জীব নেই। আমরা যখন এমন কথা বলি যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্বশীল, এবং তাদের জীবন সচেতন ভাবে ঈশ্বর-অভিমুখী হবে, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের আমরা এমন সম্পর্ককে নির্দেশ করি, যা স্বর্গদূত ছাড়া কোনও সৃষ্ট জীবের মধ্যে দেখা যায় না। একই ভাবে, আমরা যখন বলি যে, একজন মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে সচেতন সহভাগিতার অধিকারী, এবং তাদের জীবন মানুষ-অভিমুখী হবে, তখন আমরা তাদের এমন একটি সম্পর্ককে নির্দেশ করি, যা কোনও সৃষ্ট জীবের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়, সম্ভবত স্বর্গদূতদের মধ্যেও নয়, যারা একে অন্যের সঙ্গে মানুষের ন্যায় সম্পর্কবদ্ধ নয়। আবার আমরা যখন এমন কথা বলি যে, ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার ও তার যত্ন নেবার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তখন আমরা তার বিষয় এমন সম্পর্ককে নির্দেশ করি, যা কোনও সৃষ্ট জীবের মধ্যে, এমনকী স্বর্গদূতদের মধ্যেও পাওয়া সম্ভব নয়।

আবার, এই তিনটি সম্পর্কের প্রতিটি সম্পর্ক ঈশ্বরের নিজের সত্তার প্রতিফলন। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের দায়িত্ব এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তার সচেতন সহভাগিতা হল মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সহভাগিতা ও প্রেমের প্রতিফলন। একজন মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের সহভাগিতা হল ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে সহভাগিতার প্রতিফলন (যোহন ১৭:২৪ পদে বলা হয়েছে, ***"কেননা জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তুমি (পিতা-ঈশ্বর) আমাকে (পুত্র-ঈশ্বর) প্রেম করেছিলে"***)। আর পৃথিবীর উপরে মানুষের কর্তৃত্ব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করেছেন, তাদের সকলের উপর ঈশ্বরের চরম আধিপত্যের প্রতিফলন। এই সাদৃশ্য এতখানি যে গীত ৮ অধ্যায়ের লেখক এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, ***"তুমি তাকে ঈশ্বর অপেক্ষা অল্প ন্যূন করে সৃষ্টি করেছ"*** (৫ পদ)।

এই তিন-সম্পর্ক যেহেতু একমাত্র মানুষের মধ্যে বর্তমান, এবং সে যেহেতু এই তিনটি সম্পর্কের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করে থাকে, সেইহেতু আমরা এমন কথা বলতে পারি যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সঠিক ব্যবহার (কাজ) এই তিনটি সম্পর্কের মাধ্যমে সাধিত হওয়া প্রয়োজন: ঈশ্বরের প্রতি, প্রতিবেশির প্রতি, এবং প্রকৃতির প্রতি। এই সত্য আমরা এর আগে খ্রীস্টকে ঈশ্বরের নিখুঁত

সৃষ্টির সময় মানুষ নিষ্পাপ ছিল এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য ছিল। তাদের এই পরিস্থিতিকে আগস্টিন *(Augustine)* এইভাবে বর্ণনা করেছেন, **"তারা পাপ না করতে সক্ষম ছিল"** *("They were able not to sin")*। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা পাপ করতে পারত না। এই পরিস্থিতিতে তাদের পাপ করারও সম্ভাবনা ছিল। তারা কেবল পথ অতিক্রম করছিল। আর এই সময় তারা ঈশ্বরের আজ্ঞার বাধ্য না হতেও পারত। অর্থাৎ আদম পাপ করবার সম্ভাবনা নিয়েই জীবন যাপন করছিল, কারণ সে তখনও নিখুঁত বা অপরিবর্তিত অবস্থায় উন্নত হতে পারেনি। এই সম্ভাবনা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির একটি দিক নয় কিন্তু এ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির একটি গণ্ডি বা সীমা। সোজা কথায়, মানুষ শুরুতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে সৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু সে তখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি, কারণ তাদের বৃদ্ধি পাবার ও পরীক্ষিত হবার প্রয়োজন ছিল। তারা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকে কিনা, তা দেখবার জন্য ঈশ্বর তাদের একটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন (আদি. ২:১৬-১৭)। যদি আদম, হবা ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা পালন করত, তাহলে মানুষের ইতিহাস কোন্ দিকে মোড় নিত কে জানে?

৫। দূষিত প্রতিমূর্তি (Perverted Image)

মানুষের পাপে পতনের পর, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি, কিন্তু তা দূষিত বা কলুষিত হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বিভিন্ন গঠনগত দিক অর্থাৎ বিভিন্ন দান, তালন্ত ও ক্ষমতা এখনও তাদের মধ্যে আছে; কিন্তু ঐ সমস্ত দান ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। ফলস্বরূপ, প্রকৃত মানুষ হবার জন্য যে তিনটি সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল, সেগুলির প্রত্যেকটি দূষিত হয়েছে। মানুষের এই পরিস্থিতিকে পাপের দাসত্ব বা **পাপ না করতে অক্ষমতা** বলা যেতে পারে *("Not able not to sin")*।

ক) ঈশ্বরের প্রতি সম্পর্ক দূষণ:

ঈশ্বর উপাসনার পরিবর্তে মানুষ বিভিন্ন প্রতিমা পূজা করে চলেছে (রোমীয় ১:২০-২৩)। আদিযুগে মানুষ কাঠ, মাটি, পাথরের দ্বারা নির্মিত প্রতিমার পূজা করত। কিন্তু, বর্তমান কালের মানুষ সেই প্রতিমার স্থানে নিজেকে বা সমাজকে বা দেশকে বা অর্থকে বা খ্যাতিকে বা ধনসম্পত্তিকে বা জাগতিক আনন্দকে বসিয়েছে। একইভাবে, মানুষ তার যুক্তিকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের প্রশংসা না করে, মানুষের বা মানুষের কৃত কর্মের প্রশংসা করছে। নৈতিকতার নামে ভুলকে ঠিক এবং ঠিককে ভুল বলে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

খ) প্রতিবাসীর প্রতি সম্পর্ক দূষণ:

সহভাগিতার পরিবর্তে পাপে পতিত মানুষ একজন অন্যের প্রতি নিজের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে সচেষ্ট। ফলস্বরূপ, আমাদের বাক্ শক্তির দ্বারা আমরা অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং প্রতিবেশীকে আঘাত করছি। সাহিত্য বা কলা মাংসিক অভিলাষে, ব্যাভিচারে আক্রান্ত। স্ত্রী পুরুষের মনোরম সম্পর্ক ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। আজ মানুষ নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক করতে সচেষ্ট।

গ) প্রকৃতির প্রতি সম্পর্ক দূষণ:

ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থেকে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব সাধন করার পরিবর্তে, মানুষ আজ প্রকৃতির বিভিন্ন ধন তার নিজের স্বার্থপর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের কাজে ব্যবহার করে চলেছে। ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য এবং প্রতিবেশীর উপকারের জন্য প্রকৃতির উপর তার যে আধিপত্য দত্ত হয়েছিল, তা সে পাপ-পূর্ণ পদ্ধতিতে ব্যবহার করে চলেছে। ফলস্বরূপ, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে প্রাকৃতিক ধন সমূহ ধ্বংস করে চলেছে। কলকারখানাগুলি নদী, জল বাতাস বা পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। সবার উপরে পারমাণবিক বোমা মানুষের জীবনের আতঙ্ক নিয়ে এসেছে এবং মানুষের বর্তমান সংস্কৃতি মানুষকেই উচ্চীকৃত করে চলেছে।

৬। নতুনীকৃত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি (Renewed Image of God)

ঈশ্বরের দূষিত প্রতিমূর্তি পরিত্রাণের পথে নতুনীকৃত হয়ে চলেছে। দূষিত বা বিকৃত প্রতিমূর্তি পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা পরিশুদ্ধ ও সঠিক আকৃতির উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই নতুনীকরণের কাজ নতুন জন্মের দ্বারা শুরু হয়। নতুন জন্ম হল সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মার কাজ, যা কোনও একজন মানুষকে খ্রীস্টের সঙ্গে একীভূত করে এবং তার আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত হৃদয়কে জীবিত করে। এর ফলস্বরূপ, সে স্বেচ্ছায় সুসমাচারে বিশ্বাস করতে ও প্রভুর সেবা করতে আগ্রহী হয়। এই নতুনীকরণের কাজ শুদ্ধিকরণের দ্বারা এগিয়ে যায়। শুদ্ধিকরণ হল মূলত পবিত্র আত্মার ক্রমশ অনুগ্রহের কাজ, কিন্তু এই কাজে মানুষের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণও বর্তমান। এরদ্বারা, পবিত্র আত্মা সেই মানুষটিকে পাপের দূষণ থেকে অল্প অল্প করে মুক্ত করেন এবং তাকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে সমর্থ করেন। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের দেওয়া ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বিভিন্ন গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে ঈশ্বরের প্রশংসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পবিত্র আত্মা সেই বিশ্বাসীকে সক্ষম করেন।

ক) ঈশ্বরের প্রতি

মানুষ এখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সঠিক ভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, সঠিক পদ্ধতিতে ঈশ্বরের উপাসনা